Living the Lotus 6

Buddhism in Everyday Life

2025
VOL. 237

2025 Northern California Cherry Blossom Festival
Rissho Kosei-kai Members in North America
Participate in the Grand Parade in San Francisco

Living the Lotus
Vol. 237 (June 2025)

Senior Editor: Keiichi Akagawa
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editor: Kanchan Barua, Protik Barua

Living the Lotus is published monthly
By Rissho Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিস্‌সো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনেরত শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিস্‌সো কোসেই-কাই।

বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানাস্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাত রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটাস (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা〜দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্দমাক্ত মাটিতে প্রস্ফুঠিত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

"মাতৃ-পিতৃভক্তি" বিষয়টি কী?

রেভারেন্ড নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিস্সো কোসেই কাই।

মানুষকে ঘৃণা না করা এবং বিরোধে না জড়ানো

"পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাইলে, পিতামাতা তখন আর জীবিত থাকে না। অতএব, পাথরের (শ্মশানে) ওপর কম্বল দেওয়া সম্ভব নয়" এমন একটি প্রবাদ রয়েছে। 'মা-বাবা জীবিত থাকতেই যদি তাঁদের প্রতি কর্তব্য পালন করতাম' এই অনুশোচনাটি হৃদয়ে গভীরভাবে বিদ্ধ হয়ে, 'এটা একেবারেই সত্য' বলে নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানানোর মতো অনেকেই থাকবেন নিশ্চয়ই। তবে, 'পাথরের উপর কম্বল দেয়া যায় না' বললেও, তার অর্থ এই নয় যে, কিছুই করা যাবে না বা করার কোনো প্রয়োজন নেই।"

মহাবিশ্বের জন্মের সাথে সংযুক্ত এক অভূতপূর্ব জীবনের ইতিহাসে, কোনো কিছু হারানো ছাড়াই একে অপরকে যুক্ত করে, এবং জীবনের বাটন রিলের মাধ্যমে যারা আমরা বর্তমানে বেঁচে আছি, তাদের জন্য 'মা-বাবার সেবা কী'—এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা মানে হলো, পিতামাতা ও পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে আমাদের নিজের জীবনের মূলে পৌঁছানো, এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এখন, আমাদের কী করতে হবে সেই বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া।"

তাছাড়া, 'পিতামাতার প্রতি কর্তব্য' বোঝাতে ব্যবহৃত জাপানি অক্ষরটি 'বয়োজ্যেষ্ঠ' ও 'সন্তান'—এই দুটি উপাদানের সুনিপুণ সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছে, এই প্রতীকী গঠন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, কিভাবে প্রাচীন প্রজন্মের মূল্যবোধ, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে পৌঁছে যায় নতুন প্রজন্মের হৃদয়ে, এটি উত্তরাধিকার, ও নিরবিচ্ছিন্ন ঐক্যের প্রতীক। এইজন্যই, পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালন শুধু সেবা-যত্নে সীমাবদ্ধ নয়; এর অন্তরালে নিহিত রয়েছে গভীর মানবিকতা, আত্মিক সংযোগ, আর কৃতজ্ঞতার এক গভীর তাৎপর্য, যা অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই।

তবে 'দৃষ্টান্ত বাক্য' গ্রন্থে, কনফুসিয়াসকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় 'সন্তানের কর্তব্য বলতে কী বোঝায়?' তিনি খুব সহজভাবে উত্তর দেন: 'পিতা-মাতা সন্তানের শারীরিক রোগ-ব্যাধি নিয়ে সবসময় উদ্বিগ্ন থাকেন। তাই সন্তানের জীবনযাপন এমন হওয়া উচিত যাতে তাঁদের মনে অস্থিরতা বা দুশ্চিন্তা জন্ম না নেয়।' নিশ্চয়ই, এ কথা গভীর অর্থবহ। তবে, এখানে 'শারীরিক ব্যাধি' বোঝাতে ব্যবহৃত জাপানি অক্ষরটি বিশ্লেষণ করলে দেখা

যায়—এর অর্থ শুধু অসুস্থতা নয়, বরং 'ঘৃণা, হিংসা, ঈর্ষা, যন্ত্রণা, এমনকি সংঘাত'-এর মতো অর্থও বোঝায়। জাপানের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ইয়াসুওকা মাসাহিরো-এর ব্যাখ্যায়, 'এই ব্যাধি' আসলে 'বিরোধ' বা 'সংঘর্ষ'—এই অর্থেও ধরা যায়।

তাই শুধু পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্কেই নয়, জীবনের প্রতিটি মানবিক সম্পর্কে—নিজের স্বার্থ, অহংকার কিংবা বিরোধ যেন সেই সম্পর্কের মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটায়, সে বিষয়ে আমাদের সংযত থাকা প্রয়োজন। এই আত্মনিয়ন্ত্রণই হতে পারে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রকৃতপক্ষে মাতৃ-পিতৃভক্তি।

মাতাপিতার প্রতি ভক্তিহীনতা প্রাণী হত্যার সামিল

দরিদ্র মানুষের ত্রাণ সহায়তা প্রদান ও জল ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করে, মানুষের কাছে যিনি বোধিসত্ত্ব হিসেবে পূজিত হয়েছিলেন জাপানি বৌদ্ধ ভিক্ষু গিয়োকির লেখা একটি গান আছে। সেখানে তিনি বলেছেন, "পাহাড়ি পাখির কাকলি শুনি, এ কি বাবা-মা?--জাগে মনে গুণগুণি"। প্রয়াত পিতা-মাতার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও আকুলতা থেকে, পাহাড়ি পাখির হাহাকারও যেন প্রিয় পিতা-মাতার স্নেহভরা আহ্বান বলে মনে হয়... সেই অনুভবের বিষণ্নতায় হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়—এ এক হৃদয়ছোঁয়া ব্যথাতুর গান।

কিন্তু আমরা অনেক সময় এই ধরনের আবেগে ভেসে গেলেও, আমাদের জন্মদাতা পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলে যাই, এবং রূপ নিয়ে হতাশ হই বা মন মতো না চলা জীবন নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করি। তবে, এটি প্রাপ্ত জীবনকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণে ব্যর্থ হওয়া, যা পিতামাতার প্রতি অবজ্ঞা হিসেবে বিবেচিত হয়। সোতো সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু ইয়োগো সুইগান মহোদয় বলেছেন, এটি "প্রাণীহত্যা না করার নীতির লঙঘন" হবে। ধর্মগুরু ইয়োগো বলেন, "স্বর্গ-মর্ত্য জুড়ে প্রাণ ছড়িয়ে আছে, আর আমরা প্রত্যেকে সেই মহাপ্রাণেরই সরাসরি প্রকাশ। আমাদের সকলের মধ্যে বুদ্ধবীজ নিহিত আছে। আমাদের প্রত্যেকের জীবনই মহান, কোনো জীবনই তুচ্ছ নয়, এই জগতে অর্থহীন কোনো অস্তিত্ব নেই। আর সেই দুর্লভ জীবন, অর্থাৎ নিজের জীবনের উপর ভালো-মন্দের বিচার আরোপ করা মানে, জীবনের মূল উৎসকে অবজ্ঞা করা, যা হত্যার সামিল। এটি গৃহী বৌদ্ধদের জন্য পালনীয় পঞ্চশীলের অন্যতম "প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকা" নীতি লঙঘন করার মতোই গুরুতর অপরাধ।

সেই অর্থে, রাগ, অসন্তোষ বা প্রবল আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবকে যতটা সম্ভব সংযত রেখে, অন্যদের সঙ্গে বিরোধ না করে, নিজের মধ্যে অন্তর্নিহিত বুদ্ধ প্রকৃতির উপর বিশ্বাস রাখা এবং সমস্ত কিছুকে সত্য ও ধর্মের প্রকাশ রূপে সরলভাবে গ্রহণ করাই—আমাদের পক্ষে প্রকৃত পিতৃ-মাতৃ সেবা। তদ্ব্যতীত, মানুষসহ সমগ্র প্রকৃতির কার্যকলাপ এক অবিরাম অগ্রগতি, উৎকর্ষ ও সৃষ্টিশীলতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই নিজের ব্যক্তিগত বিকাশের পাশাপাশি আগামী প্রজন্মের দায়িত্ব গ্রহণ অর্থাৎ 'মানুষ তৈরী' করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এর মাধ্যমে আমরা অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত প্রাণধারার সঙ্গে যুক্ত হতে পারি—এটিও পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের একটি প্রক্রিয়া বলে মনে করি। আর এই সব কিছুর মূল চাবিকাঠি হলো "সততা ও সহনশীলতা" নামক অন্তরস্থ মনোভাব ও আচরণ, যার মধ্যে উপরের সমস্ত শিক্ষার সারাংশ নিহিত। ক্ষমা করা, গ্রহণ করা, আন্তরিকতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করা—এই গুণগুলোকে প্রতিদিনের জীবনে অনুশীলনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ, মহান সম্প্রীতির চেতনার বিস্তার এবং উত্তরাধিকার।

কোসেই,জুন ২০২৫ইং।

বুদ্ধের শিক্ষায় অনুপ্রাণীত হয়ে সাধ্যমতো মানুষের কল্যাণে কাজ করে যেতে চাই

মিয়াদাগুমা গুরগো, মঙ্গোলিয়া এরডেনেট ধর্ম সেন্টার।

১৫ মার্চ, ২০২৫ তারিখে পবিত্র মূল মন্দিরে অনুষ্ঠিত বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ দিবসের অনুষ্ঠানে এই বক্তব্যটি উপস্থাপন করা হয়েছিল।

সবাইকে নমস্কার।

আমি ১৯৫৮ সালে দশ ভাইবোনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কন্যা হিসেবে জন্মগ্রহণ করি। আমার মা-বাবা দুজনেই রেলস্টেশনে কাজ করতেন, সেই কারণে আমাদের পরিবারটি এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশনে স্থানান্তরিত হতে থাকত। মা-বাবা সকাল ভোর থেকে রাত অবধি কঠোর পরিশ্রম করতেন, ফলে তাদের অনুপস্থিতিতে ছোট ভাই-বোনদের দেখাশোনা ও গৃহস্থলির কাজ আমার কাঁধে এসে পড়ে। যদিও ব্যস্ততায় কাটত প্রতিটি দিন, তবুও একটি প্রাণবন্ত পরিবারে আমি সুখেই দিন কাটিয়েছি। যেহেতু আমার অনেক ছোট ভাই-বোন ছিল, তাই ছোটদের সঙ্গে সময় কাটাতে কাটাতে মনে মনে ভাবতাম, ভবিষ্যতে হয়তো শিক্ষক কিংবা শিশু চিকিৎসক হবো—এটাই হয়ে ওঠে আমার স্বপ্ন।

আমার বাবা ছিলেন নিঃস্বার্থ, সদা পরোপকারী মানুষ, বিনিময়ে তিনি কারো কাছে কিছু আশা করতেন না। মা ছিলেন স্নেহপরায়ণা, মানুষের মুখে আহার তুলে দিতে সদা সচেষ্ট। কিন্তু বাবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। মা এখন ৮৭ বছর বয়সেও যথেষ্ট সুস্থ, এতটাই কর্মক্ষম যে এখনো সন্তান-নাতিদের জন্য মঙ্গোলিয়ার ঐতিহ্যবাহী পোশাক নিজ হাতে সেলাই করেন। দুই বছর আগে মায়ের ৮৫তম জন্মদিন উদযাপনের সময় উপলব্ধি করলাম, বাবা-মা দুজনের সূত্রে যে পরিবার শুরু হয়েছিল, তা এখন ১০৮ সদস্যের এক বিশাল পরিবারে পরিণত হয়েছে।

গ্রেটসেক্রেট হলে বক্তব্য রাখছেন মিসেস মিয়াদাগুমা।

আমি ১৯৮২ সালে মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাটরের জাতীয় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে বহু প্রতীক্ষিত স্বপ্ন—একজন শিশু চিকিৎসক হওয়ার সুযোগ লাভ করি। পরে আমার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় হয়, ১৯৮৫ সালে কন্যা এবং ১৯৮৯ সালে পুত্রসন্তানের মা হই। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে মতপার্থক্য ও মূল্যবোধের সংঘাতে একসময় স্বামীর হাতে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হই। সাত বছরের মধ্যে এই দুঃসহ সম্পর্ক থেকে মুক্তি পেতে সন্তানদের নিয়ে তালাকের পথ বেছে নিই এবং মঙ্গোলিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এরডেনেট-এ স্থানান্তরিত হই। সেখানে একটি আঞ্চলিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক হিসেবে কাজ শুরু করি।

১৯৯১ সালের দিকে তোলা পারিবারিক ছবি (মিয়াদাগুমা মাঝখানের সারিতে একেবারে ডানদিকে)

এরডেনেটে নতুন করে জীবন শুরু করার পর একজন সদয়, সহানুভূতিশীল মানুষকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পাই। তিনি আমার সন্তানদের ভালোবাসতেন এবং আমরা আনন্দের সাথে শান্তিপূর্ণ দিন কাটাতে থাকি। ঠিক সেই সময়ই একজন পরিচিত ব্যক্তি আমার সাথে যোগাযোগ করে রিয়েল এস্টেট ব্যবসার প্রস্তাব দেন।

সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য আরও টাকার প্রয়োজন, এই কথা ভেবে, আমি ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করি। কিন্তু ব্যবসা শুরু করার পর, পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবসা এগিয়ে যায়নি, এবং কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারি যে, আমি প্রতারণার শিকার হয়েছি। তারই মাঝে ২০০৫ সালে আমার স্বামী অসুস্থ হয়ে মারা যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়। আমি ঋণের বোঝা ও সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব একাই কাঁধে তুলে নিই। এক মুহূর্তে যেন সুখের স্বর্গ থেকে হতাশার গভীরে নিক্ষিপ্ত হয়েছি।

আমার স্বামী মারা যাওয়ার কিছুদিন পর, আমার ধর্মীয় অভিভাবক এন্‌ফুতোয়া মহোদয়ার কাছে "মঙ্গোলিয়া রিস্‌সো কোসেই কাই" সম্পর্কে জানতে পারি, এটি মঙ্গোল ভাষায় সূত্র পাঠ করে, প্রকৃতি, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও পরার্থপরতার শিক্ষাদান করে—এমন একটি সংগঠন। বিষয়টি মনে গেঁথে যায় এবং একদিন সেখানে যাওয়ার ইচ্ছে পোষণ করি।

২০০৬ সালে উলানবাটরে অবস্থিত মঙ্গোলিয়া রিস্‌সো কোসেই কাই পরিদর্শনের সুযোগ হয়। ছোট্ট একটি অ্যাপার্টমেন্ট ঘরে জোরিগমা শাখা প্রধানসহ পাঁচজন নারী মঙ্গোল ভাষায় প্রার্থনা করছিলেন। আমি নিজেও অংশ নিই এবং "অমিতার্থ সূত্র"-র দশগুণ অধ্যায়ে বর্ণিত "দশ অকুশলকর্মে লিপ্ত লোককে দশ কুশলকর্ম সম্পাদনে উৎসাহিত করে" এই অংশটিতে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। তখন আমার মন ভেঙে পড়েছিল, ঋণ আর সন্তানের দুশ্চিন্তায় আত্মগ্লানিতে জর্জরিত ছিলাম। তবুও মনে হলো, এমন পবিত্র সূত্র প্রতিদিন আবৃত্তি করলে মন পবিত্র হবে। যদি শিশু বয়স থেকেই এর পাঠ শুরু করা যায়, তাহলে কত সুন্দরভাবে চরিত্র গঠিত হতো! প্রার্থনার পর আমি বলেছিলাম, এরডেনেটের শিশুদেরকেও এই সূত্র পাঠের সাথে সম্পৃক্ত করতে চাই।

দুই মাস পর, জোরিগমা শিবুছো ও তার চার সাথী ২২০ কিমি দূরের এরডেনেট শহরে মিশনারী কাজে আসেন। আমি আমার কর্মস্থলের একটি কক্ষে ছয়জন প্রতিবেশী এবং তাদের ২০ জন সন্তানকে নিয়ে ধর্মালোচনায় অংশগ্রহণ করি। পরে আমাদের বাসায় পরলোকগত পূর্বপুরুষদের মরণোত্তর ধর্মীয় নাম প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ধর্মসভায় সেই শিশুরা ও প্রাপ্তবয়স্করাও অংশগ্রহণ করেন। শাখা প্রধান জোরিগমা বলেছিলেন, "২১ দিন ধরে প্রতিদিন প্রার্থনা করলে মনোবাসনা পূর্ণ হবে।" তাই আমরা সকলেই প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে আমাদের বাড়িতে একটি প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। "যদি সূত্র পাঠ করো, তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে" এই উপদেশ গভীরভাবে হৃদয়ে ধারণ করে, আমরা সকলেই প্রার্থনা অনুষ্ঠান করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলাম। । এটি আমাদের হৃদয়কে ধর্মের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার একটি উপায় ছিল। এরপর নতুন নতুন সদস্য যোগ দিতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত তিন মাস ধরে চলেছিল আমাদের প্রার্থনা। সকল অংশগ্রহণকারীদের হৃদয় পবিত্র হয়েছিল, এবং বক্তব্যে তারা তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া সুখী পরিবর্তন এবং গুণাবলীর গল্পগুলি ভাগ করে নিয়েছিল। অনেকেই বলেছিল, "বিচ্ছেদের দ্বারপ্রান্তে থাকা আমাদের দাম্পত্য সম্পর্কের জট খুলে গেছে", "আমার স্বামী মদ ছেড়ে দিয়েছেন"—এমন আশ্চর্য ফল লাভের কথা একে একে জানাতে লাগলেন। এইভাবে, আমাদের বাড়িতে অবস্থিত ধর্ম কেন্দ্রের কার্যক্রম তিন বছর ধরে অব্যাহত ছিল।

যারা বাড়িতে প্রার্থনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তাদের সাথে (মিয়াদাগুমা শেষ সারিতে বাম দিক থেকে তৃতীয়)

২০১৮ সালে এরডেনেট হোজাশোতে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সাথে (মিয়াদাগুমা সামনের সারিতে বাম দিক থেকে চতুর্থ স্থানে)

এই প্রার্থনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি নিজেও অপ্রত্যাশিত আশীর্বাদ পেয়েছি। আমার মধ্যেও বড় পরিবর্তন এলো। এতদিন যে প্রাক্তন স্বামীকে ঘৃণা করতাম, এখন তাকে নতুনভাবে দেখতে শুরু করি। বুঝলাম, তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বোধোদয়ের জন্যই। পিছনে ফিরে তাকালে, আমি বুঝতে পারি যে আমার স্বামীর সাথে দেখা হওয়ার আগে, আমিও এমন আচরণ করছিলাম যা আমার চারপাশের লোকেদের কষ্ট দিত এবং দুঃখ দিত। আমার অহংকার ভেঙে গেল। তখন মনে হলো, এই দুঃখ তো ছিল মহাকরুণারই প্রকাশ! যখন আমি এইভাবে ভাবছিলাম, তখন আমার স্বামীর জন্য আমার সত্যিই খারাপ লাগছিল, যাকে আমি এত বছর ধরে ঘৃণা করে আসছিলাম। আমি সত্যিই বুঝতে পেরেছি যে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করলে হৃদয় বদলে যায়।

২০০৮ সালে আমাকে শাখাপ্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। সৌভাগ্যক্রমে, এরডেনেটের সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং সদস্যসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি ফ্ল্যাটে হোজাসো স্থাপন করা হয়। প্রতি সপ্তাহে সেখানে গিয়ে আনন্দের সাথে প্রার্থনা ও ধর্মালোচনায় অংশগ্রহণ করতাম। পরিবার, বন্ধু ও সহকর্মীদের আমি ধর্মের পথে আনতে পেরেছি। বর্তমানে আমার দ্বারা অনুপ্রাণীত লোকের সংখ্যা ২৪০ জন। কোসেই কাই-এর সঙ্গে সাক্ষাতের আশির্বাদে আমার জীবন আমূল বদলে যায়। আমি যত বেশি প্রার্থনা নিবেদন করেছি এবং শিক্ষাগুলি অধ্যয়ন করেছি, ততই আমি মেনে নিয়েছি যে আমার জীবনে যা

২০১৮ সালে এরডেনেট হোজাতে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের পর (বাম দিক থেকে: আন্তর্জাতিক মিশনের পরিচালক রেভা. সাইতো, মিসেস মিয়াদাগুমা এবং উপ-পরিচালক হিরোসে)

কিছু ঘটছে, তা ছিল আমার উন্নতির জন্য বুদ্ধের করুণাপূর্ণ আশীর্বাদ।

কিন্তু সেই মানসিক অবস্থায় পৌঁছানোর আগে, আমাকে আরেকটি চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে হয়েছিল। ২০১৪ সালে নাতির জন্মের সময় আমাকে তার দেখাশোনা করার জন্য অস্থায়ীভাবে উলানবাটরে থাকতে হয়েছিল। এরডেনেট ধর্মকেন্দ্রের দায়িত্ব, আমি মিঃ 'এ'-এর উপর অর্পণ করি। এক বছর পর ফিরে দেখি, তিনিই আমার পরিবর্তে শাখাপ্রধান হিসেবে আমার স্থান গ্রহণ করেছেন। আমার অজান্তেই এবং আমার পরামর্শ ছাড়াই সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছে জেনে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম, এতদিন মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করেও কেউ আলোচনা করল না! আমি গভীরভাবে বিষণ্ণ হয়ে পড়ি, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি এবং ধর্মচর্চা থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছিলাম। এই মানসিক অবস্থা প্রায় তিন বছর ধরে চলতে থাকে, এবং আমি সবসময় মানসিকভাবে অস্থির বোধ করতাম এবং আমার খুব দুঃখ হত।

সেই সময়, হঠাৎ একদিন অনুতাপের সূত্র নামে খ্যাত সমন্তভদ্রের সাধনা সূত্র পাঠ করতে গিয়ে আমার মনে হলো, সমস্যার মূল আমার ভিতরেই। যখন আমি নিজের দিকে ফিরে তাকালাম, তখন বুঝতে পারলাম যে আমার একটা অহংকারী মনোভাব ছিল, ভাবছিলাম, "আমিই সেই ব্যক্তি, যে এরডেনেট হোজাশো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।" সেই মুহূর্তে, আমি বুঝতে পারলাম যে আমার কষ্টের কারণ হলো আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা। ভাবতাম "আমি অন্য কারো চেয়ে বেশি পরিশ্রম করছি," এবং "আমি ঠিক আর অন্যজন ভুল।" আসলে, নিজের সঠিকতা আর অন্যের ভুল ধরার মানসিকতাই ছিল দুঃখের কারণ। সূত্রে যেমন বলা হয়েছে, "দশ অকুশলকর্মে লিপ্ত লোককে দশ কুশলকর্ম সম্পাদনে উৎসাহিত করা।" ভাবলাম, সম্ভবত এই কষ্টই ছিল বুদ্ধের মহান করুণা যা আমাকে আমার অহংকার সংশোধন করতে শিখিয়েছে। যখন আমি বুঝতে পারলাম এটা বুদ্ধের পরিকল্পনা, তখন আমার সারা শরীর আনন্দে শিহরিত হলো এবং সবকিছু উজ্জ্বল আলোর মতো উদ্ভাসিত হতে লাগলো। আমি তৎক্ষণাৎ হোজাশোতে গেলাম এবং আমার ভুলের জন্য অনুতপ্ত হলাম। আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ যে, সংঘবন্ধুরা আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

২০১৮ সালে আমাদের এরডেনেট হোজাশো আনুষ্ঠানিকভাবে সদর দপ্তরে নিবন্ধিত হয়। তৎকালীন আন্তর্জাতিক মিশন বিভাগের পরিচালক কোইচি সাইতো এবং আন্তর্জাতিক মিশন বিভাগের উপ-পরিচালক ইকুয়ো হিরোসে মহোদয়ের উপস্থিতিতে হোজাশোতে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, এবং তখন উপ-পরিচালক হিরোসে মহোদয় আমাকে ধর্মটিচার এর সনদ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন। এইভাবে, যখন নিজের ত্রুটিগুলি বুঝতে পেরে, তার জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলাম, তখন বুদ্ধ আমাকে এই অপ্রত্যাশিত উপহার দিয়েছিলেন বলে মনে করি।

২০২০ সালে আমার লিভার ক্যান্সার ধরা পড়ে। তবে, রোগ নির্ণয়ের কথা শুনে আমার কোনও ভয় লাগেনি। আমার লিভারের চারটি জায়গায় ক্যান্সার খুঁজে পেয়েছে এবং আমাকে বলেছে যে আমার লিভারের বেশিরভাগ অংশ অপসারণের জন্য বড় অস্ত্রোপচার করতে হবে। সেই সময়, সংঘবন্ধুরা এক মাস ধরে আমার সুস্থতার জন্য সূত্র পাঠ করেছিলেন। সংঘের উষ্ণতা আমাকে উৎসাহিত করেছে, এবং সকলের আশীর্বাদে এই অসুবিধা কাটিয়ে দীর্ঘ জীবনযাপন করার সুযোগ পেয়েছি।ভবিষ্যতে বহু মানুষের কাছে এই শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার তীব্র ইচ্ছা আছে। ২০২১ এবং ২০২৩ সালে ক্যান্সার পুনরাবৃত্তি হয় এবং পুনরায় অস্ত্রোপচার করা হয়। প্রতিবারই, ধর্মের আশীর্বাদে আমি শান্তভাবে কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। সম্প্রতি আবারও অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। তবুও ভয়ের কিছু নেই, এবং চিন্তিত হওয়ারও কিছু নেই। যদি ধর্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হতো, হয়তো চিকিৎসক হয়েও ক্যান্সারের ভয়েই মুষড়ে পড়তাম। কিন্তু এখন জানি—সবকিছু বুদ্ধের করুণাপূর্ণ আশীর্বাদ, তাই শান্তভাবে সবকিছু মেনে নিতে পারছি।

আজ আমার একটি স্বপ্ন আছে—যত বেশি সম্ভব মানুষের পাশে দাঁড়ানো। তার জন্য আমি দীর্ঘজীবন লাভের জন্য প্রার্থনা করি। ধর্মশিক্ষাগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যেতে চাই, যাতে কোভিডের কারণে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া এরডেনেটের কার্যক্রম যেন আবার সক্রিয় হয়। সকলের সুস্বাস্থ্য ও শান্তিসুখ কামনায় আরোও মনেপ্রাণে মিশনারী কাজ করে যেতে চাই।

২০১৮ সালে ধর্মটিচার সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে মঙ্গোলিয়ানরা (মিয়াদাগুমা, বাম থেকে দ্বিতীয়)

কার্টুন, রিস্‌সো কোসেই-কাই প্রবেশিকা

রিস্‌সো কোসেই কাই-এর স্থাপনা পরিচিতি

পবিত্র মূল মন্দির

প্রধান মূর্তি “কল্পযুগের বিরাজমান মহান হিতৈষী শ্বাশত শাক্যমুনি বুদ্ধ”-এর মূর্তি স্থাপন করে সদস্যদের প্রধান ধর্মচর্চাকেন্দ্র হিসেবে ১৯৬৪ সালে নির্মিত হয়েছিল এই “পবিত্র মূল মন্দির”।

পুণ্ডরীক সূত্রকে বৃত্তাকার শিক্ষা বলা হয়, তাই এটি গোলাকার আকৃতিতে নির্মাণ করা হয়েছে। আশেপাশের আটটি স্তম্ভ রয়েছে যা আর্যষ্ঠাঙ্গিক মার্গের প্রতীক।

(লিভিং দ্য লোটাস জানুয়ারী থেকে এপ্রিল ২০২৩ সংখ্যা) চতুর্থ তলা হলো প্রধান হল যেখানে প্রধান মূর্তিটি স্থাপন করা হয়েছে। পঞ্চম থেকে সপ্তম তলা ধর্মবৈটক (হোজা) করার স্থান। দ্বিতীয় তলা হলো ডাইনিং রুম, সপ্তম তলায় একটি "ধ্যান কক্ষ" আছে।

২০০৬ সালে, ভূমিকম্প-প্রতিরোধী নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছিল এবং ভবনটি সংস্কার করা হয়েছিল।

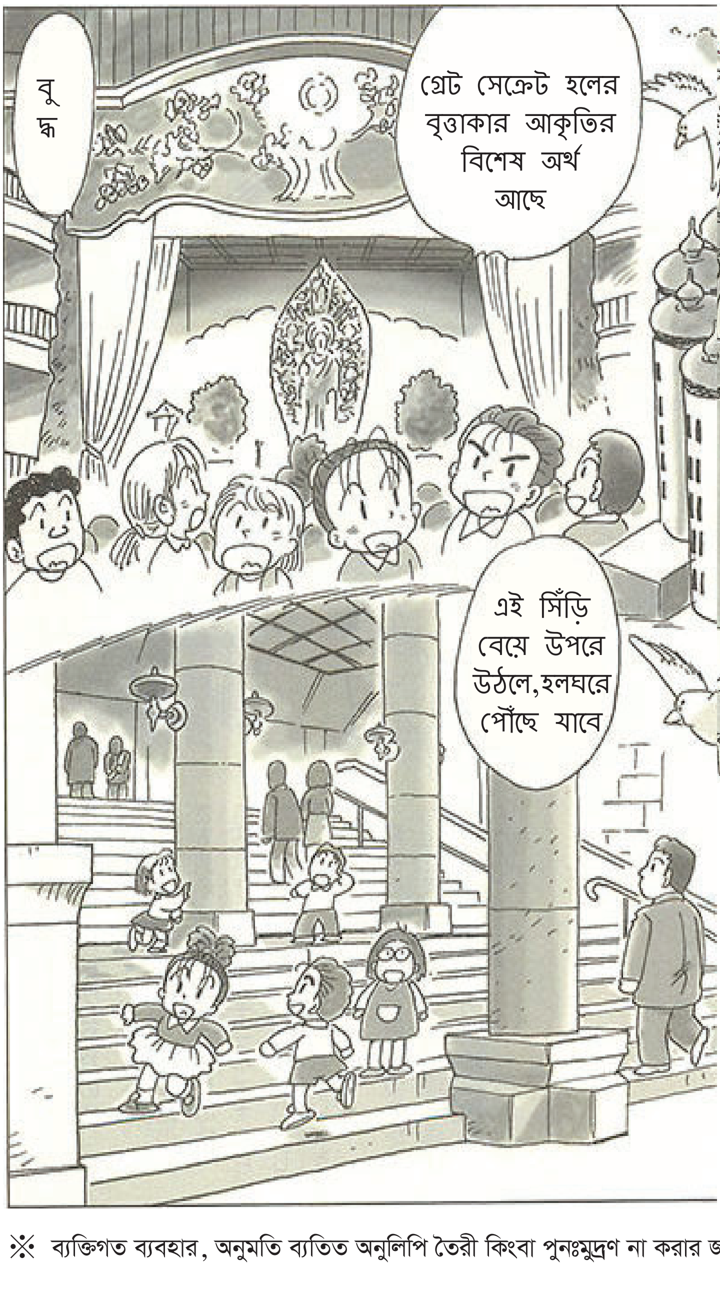

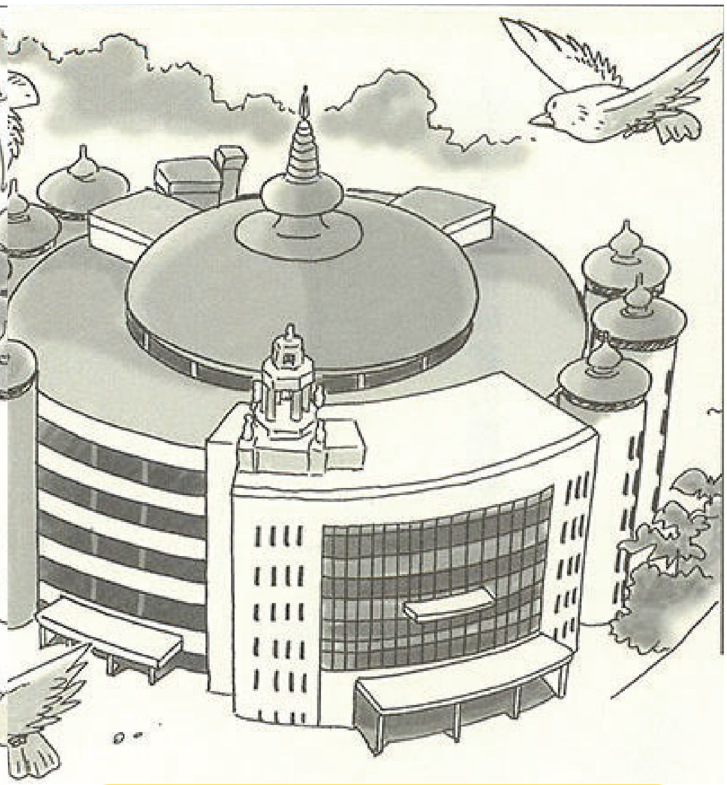

পাদটিকা

গ্রেট সেক্রেট হল (দাইসেইদো) এর মূল প্রবেশদ্বারের সামনে তিনজন বোধিসত্ত্বর চিত্র সজ্জিত রয়েছে। দর্শকের দিক থেকে ডানের দিক থেকে শুরু করে তারা হলেন: মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব, সমন্তভদ্র বোধিসত্ত্ব, এবং মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব। মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব হলেন প্রজ্ঞার প্রতীক, সমন্তভদ্র বোধিসত্ত্ব কর্ম ও সাধনার প্রতীক, এবং মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব হলেন মৈত্রী ও করুণার প্রতীক।

※ ব্যক্তিগত ব্যবহার, অনুমতি ব্যতিত অনুলিপি তৈরী কিংবা পুনঃমুদ্রণ না করার জন্য অনুরোধ রইল।

রিস্‌সো কোসেই কাই-এর উৎপত্তিস্থলে নির্মিত প্রথম প্রশিক্ষণ হল

"বিশাল ধর্মীয় উপাসনালয় (গ্রেডসেক্রেট হল) নির্মাণের পূর্বে, যে স্থানে মূল কেন্দ্র ছিল, সেই স্থানটিকে 'রিস্‌সো কোসেই কাই' এর জন্মস্থান ও ধর্মানুশীলন কেন্দ্র বলা হয়।

৫৬২.৮ বর্গমিটার জমির ওপর, প্রায় ১৬৫ বর্গমিটার প্রশস্ত ধর্মানুশীলন কেন্দ্রটি ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে নির্মিত হয়। এটি সম্পূর্ণভাবে সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল।

প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং মাটি বহনসহ নানা কাজে পরিশ্রম করেছেন বলে জানা যায়।

এই জন্মস্থানে ধর্মানুশীলন কেন্দ্র ছাড়াও প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-প্রতিষ্ঠাতার ব্রোঞ্জের মূর্তি এবং সহ -প্রতিষ্ঠাতার বাসস্থান 'মিওকো দেন' অবস্থিত।

পাদটিকা

প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-প্রতিষ্ঠাতার ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলি ১৯৮৭ সালে, 'রিস্‌সো কোসেই কাই জন্মস্থান স্মৃতিসৌধ' স্থাপনের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ধর্মানুশীলন কেন্দ্র পরিদর্শন করার সময়, প্রাঙ্গণটি ঘুরে দেখতে পারেন এবং রিস্‌সো কোসেই কাই প্রতিষ্ঠার শুরুর সময়ের স্মৃতি স্মরণ করতে পারেন।

※ ব্যক্তিগত ব্যবহার, অনুমতি ব্যতিত অনুলিপি তৈরী কিংবা পুনঃমুদ্রণ না করার জন্য অনুরোধ রইল।

অপছন্দের মানুষকে পছন্দ করতে শেখা

“ধর্মসন্তান” প্রতিপালন

রেভারেন্ড নিক্কিও নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

এ পর্যন্ত আমরা “অন্যের আচরণ ও কথা কীভাবে গ্রহণ করব” সেই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে এসেছি, কিন্তু নিজের আরও বড় হয়ে ওঠা এবং কর্মস্থল ও সমাজের মসৃণ অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য আরেক ধাপ এগিয়ে ভাবা প্রয়োজন।

এর মানে হলো, আমাদের দিক থেকে সক্রিয়ভাবে সহৃদয়তা দেখানো, সেবা করা, সাহায্য করা—এই ধরনের আচরণের মাধ্যমে নিজের ও অপরের মাঝে কিছু একটা গড়ে তোলার একটি ছোট্ট মানসিক প্রস্তুতি দরকার। এভাবে পরস্পর সহৃদয়তা প্রদর্শন করলে, সেবা করলে, সাহায্য করলে এবং একে অপরকে গড়ে তুললে, সেই প্রচেষ্টা একে অপরকে প্রতিধ্বনিত করে, কর্মস্থল ও সমাজ উজ্জ্বল, উষ্ণ এবং উন্নততর হয়ে ওঠে।

বৌদ্ধধর্মে “দান”কে বোধিসত্ত্বের আচরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, এবং রিস্‌সো কোসেই কাই-এ “একজন অন্যজনকে ধর্মপথে অনুপ্রাণীত করা”র লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, এই সবই মূলত নিজের পক্ষ থেকে এগিয়ে এসে কাজ করার সক্রিয় মনোভাবকে গুরুত্ব দেওয়ার ফল ছাড়া আর কিছু নয়।

"একজন অন্যজনকে পথ দেখানো"—এর অর্থই হলো "ধর্মসন্তান"কে লালন-পালন করা। সন্তান জন্ম নিলে পিতা-মাতা তাকে বড় করে তোলার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করে। শিশুকে সুস্থভাবে বড় করতে তারা বই পড়েন, অভিজ্ঞদের পরামর্শ নেন, এবং সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন—"ধর্মসন্তান" এর ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার প্রযোজ্য। এ পথে কখনও বিভ্রান্তি আসবে, কখনও কেউ মুখ ফিরিয়ে নেবে। তবে এই রকম নানা অভিজ্ঞতা, প্রচেষ্টা ও ভুলের ধাপ অতিক্রম করার মধ্যেই পারস্পরিক বিকাশ ঘটে, এবং সেখানেই রয়েছে প্রকৃত আনন্দ।

মানুষকে গড়ে তোলা—এটি মানবজীবনের অন্যতম এক গভীর আনন্দের উৎস। যদি আমরা এমন সম্পর্কের দিকে তাকাই, যেখানে একে অপরকে উৎসাহ দিয়ে উন্নতির পথে এগিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি হয়ে ওঠেন অতুলনীয় এবং সত্যিই কৃতজ্ঞতার যোগ্য একজন মানুষ।

"অপছন্দের মানুষকে ভালো লাগতে শেখা" এই প্রশ্নের ক্ষেত্রেও, শুধু নিজেকে আত্মবিশ্লেষণ করে পরিবর্তন করা, অপরের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা এবং কোমল হৃদয়ে অধিকারী হওয়া—এই তিনটি উপায়ই নয়, এর পাশাপাশি কোনো না কোনোভাবে অপরকে সেবা করার সক্রিয় মনোভাবই সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

নিওয়ানো নিক্কিও বাণী সংগ্রহ ১『বোধিবীজকে জাগ্রত করা』পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮।

Director's Column

দূরে থাকলেও মাতৃ-পিতৃভক্তি

Rev. Keiichi Akagawa
Director, Rissho Kosei-kai International

সবাইকে আন্তরিক অভিবাদন।

জুন মাসে আমরা প্রবেশ করেছি, দেখতে দেখতে বছরটির অর্ধেক পথ অতিক্রান্ত করেছি। বসন্ত থেকে গ্রীষ্মে রূপান্তরের এক নিঃশব্দ সংকেত হিসেবে টোকিওর আকাশে বর্ষার ছায়া নেমে এসেছে।

এই মাসে আমাদের শ্রদ্ধেয় সভাপতির ধর্মোপদেশের মূল বিষয় 'মাতৃ-পিতৃভক্তি'। এ কথাটি আমার হৃদয়ে একটু ব্যথা জাগায়। কারণ, আমি আমার পৈতৃক ভিটা আকিতা ছেড়ে টোকিওতে আসি প্রায় ঊনচল্লিশ বছর আগে। সেই দীর্ঘ সময়ে, আমার অসুস্থ পিতার সেবা ও শেষযাত্রার সঙ্গী হয়েছিলেন আমার জ্যেষ্ঠ ভগিনী ও তাঁর পরিবার। আর আজ, নব্বই পেরোনো আমার মায়ের দেখভালের ভারও সেই ভগিনীর উপরেই অর্পিত।

মায়ের মাঝে কিছুটা স্মৃতিভ্রংশের লক্ষণ দেখা দিলেও, নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা, ডে-কেয়ার সেবা এবং পরিবারপরিজনের স্নেহের পরশে তিনি বর্তমানে ঘরেই এক শান্ত ও মর্যাদাপূর্ণ বার্ধক্য যাপন করছেন।

গত বছরের শেষে, পিতার ত্রয়োদশ প্রয়াণবার্ষিকী উপলক্ষে বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার চল্লিশোর্ধ ভাগ্নে হঠাৎ এক মর্মস্পর্শী কথা বলল: তোমার ফোন পেলে দিদিমার আচরণ যেন বদলে যায়। তিনি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন, মুখখানি আলোকিত থাকে সারাদিন। তুমি যদি একটু একটু করে প্রায়ই ফোন করো, সেটাই হবে তোমার মাতৃভক্তির বহিঃপ্রকাশ।"

মা সবসময়ই দৃঢ়চেতা মানুষ ছিলেন। তবু বয়সের ভারে, মনেও নেমে আসে অনিশ্চয়তা ও সীমাবদ্ধতার ছায়া—এই সহজ সত্যটি ভাগ্নের কথায় আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম। দূরে থাকলেও, তাঁর হৃদয়ের কাছাকাছি থাকা, তাঁর অনুভবকে ছুঁয়ে থাকা—এটিই আমার জন্য মাতৃ-পিতৃভক্তির উপায়।

সম্মানিত প্রেসিডেন্ট আমাদের যেভাবে আনুগত্য ও সহানুভূতির চর্চা করতে অনুপ্রাণীত করেছেন, আমি সেই বাণী অন্তরে ধারণ করে আন্তরিকতার সাথে প্রত্যহিক জীবনে তা বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্প করেছি।

২৯শে এপ্রিল, তাইনান ব্রাঞ্চের সদস্যদের সাথে
(রেভারেন্ড আকাগাওয়া সামনের সারির মাঝখানে)

A Global Buddhist Movement

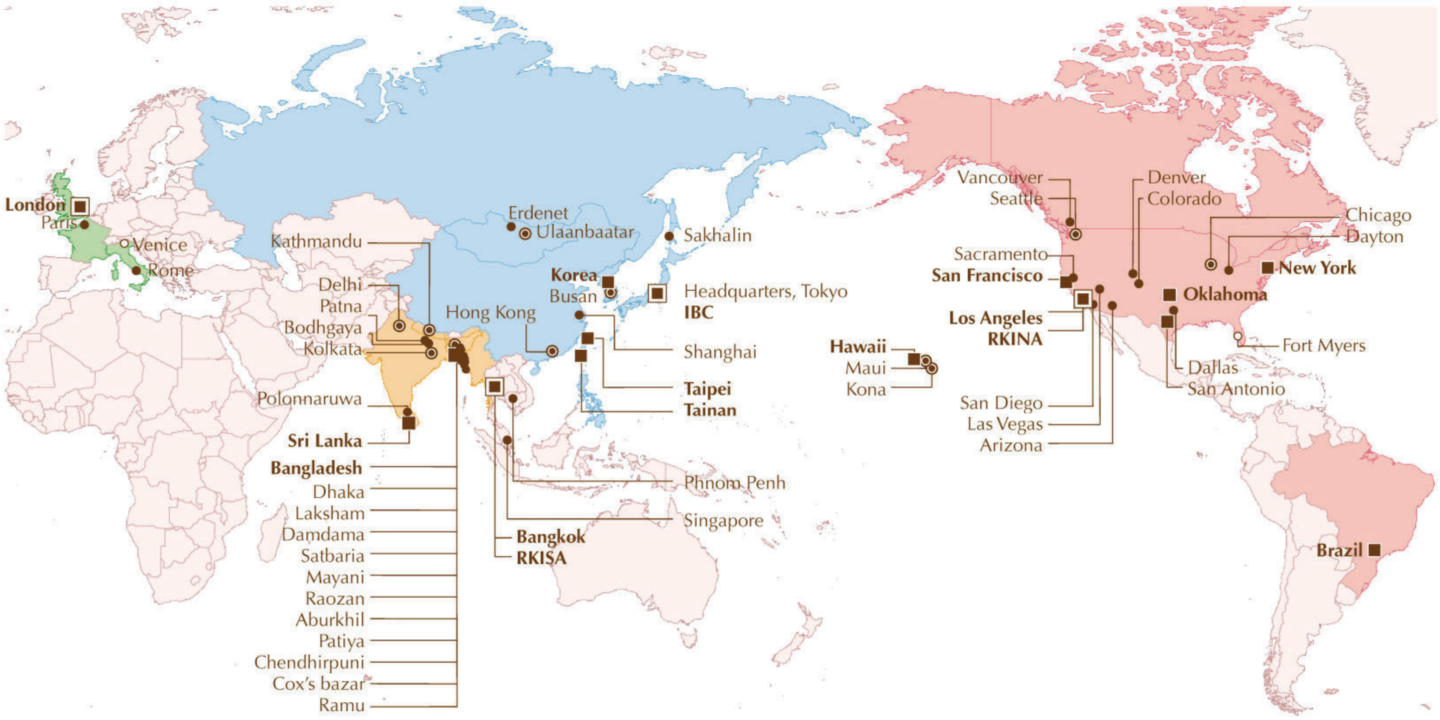

Information about local Dharma centers

facebook

X

We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp